সমাবেশ

সেলিনা হোসেন

শীতের বেলা।
অনেক দূরের গাছগাছালির মাথায় কুয়াশা জড়িয়ে আছে–নীলাভ বৃত্ত তৈরি হয়েছে রোদের। এমন একটি দৃশ্য দেখে আনমনা হয়ে যায় তৈয়ব আলি।
বেলা বাড়ছে।
ঝকঝকে সকাল। রোদ তখনো তেতে ওঠেনি। বাতাসে শীতের পরশ। চাদর জড়িয়ে কোনাকুনি রাস্তায় মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসছে মেরাজ হোসেন। দূর থেকেও বোঝা যায় বৃদ্ধ মেরাজ হোসেন কাশছে। শ্বাসকষ্ট আছে তার। মানুষটির দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে যায় সুরুজ মিয়া।
চারদিক থেকে মানুষ আসছে।
ইটের ভাটার পাশ দিয়ে হেঁটে আসছে ফুলজান বিবি। খালি পা ধুলোধূসরিত। শিশিরে-ধুলায় মাখামাখি হয়ে যায় পায়ের পাতা। গায়ে গরম কাপড় নেই। শুধু শাড়ির আঁচল দিয়ে শীত ঠেকে না। কুঁকড়ে আছে চেহারা; সে চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে যায় নয়নতারার।
আজ বিজয় দিবস।
গ্রামবাসী নিজেরাই ঠিক করেছে যে ঈদগা মাঠে তারা সমবেত হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। চারদিক থেকে লোক আসছে। ভরে যাচ্ছে মাঠ। নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর-কিশোরী মিলে বেশ বড় আয়োজন। বয়সী মানুষেরা ছোটদের দেখে ভীষণ খুশি। আজ ওদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনানো হবে।
শুরু হয় সুখ-দুঃখের আলাপ। ছোট ছোট কথা।
কী দিয়া পান্তা খাইলেন, তৈয়ব ভাই?
পান্তা! তৈয়বের বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস ওঠে। কথা বলে না।
পান্তা খান নাই?
তৈয়ব মাথা নেড়ে বলে, খাইনি।
খালি প্যাডে আসছেন?
দ্যাখ হাশেম, গাছের মাথায় কুয়াশা...
থামেন। হাশেম কড়া কণ্ঠে কথা বলে।
ধমকাস ক্যান? বাড়িতে পান্তা না থাকলে খামু কোনখান থাইকা? কাইলকা এক কেজি চাল কিনছিলাম। রাইতেই শ্যাষ। অহন আর সারা দিন রিকশা টানতে পারি না।
খাড়ান, মুড়ি-গুড় লইয়া আসি। আইজ মুড়ি-গুড় ফিরি।
হাশেম দ্রুত পায়ে চলে গেলে তৈয়ব আলি নিজের গুলিবিদ্ধ পায়ের ওপর হাত বোলায়। যুদ্ধের সময় একটি বুলেট ঊরুতে ঢুকেছিল। ওটাকে বের করা হয়নি। এখনো আছে।
বড় কষ্ট হয় রিকশা চালিয়ে এত বড় সংসার চালাতে। তার ওপর শহরে গিয়ে একা একা থাকতে এখন আর শরীর মানে না। শহরে বাসা করে থাকারও সামর্থ্য নেই। তাই পরিবারকে গ্রামে রাখতে হয়। গ্রামে বউ অন্যের বাড়িতে কাজ করে। ছেলে দুটো দিনমজুর। মেয়েরা একজন সংসার দেখে। অন্য দুজন স্কুলে যায়। উপবৃত্তির টাকা আনে সংসারে। বাকি দুই ছেলেমেয়ে ছোট। উপবৃত্তির টাকা পাবে না বলে ওদের স্কুলে পাঠানো হয় না। ভাত খাওয়ার মুখ অনেক, শুধু আয় নেই। বড় কষ্টের দিনযাপন।
বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস ওঠে। দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়, সরকারের মুক্তিযুদ্ধের তালিকায় নাম ওঠেনি বলে সে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পায় না।
তৈয়ব আলি দুই হাতে চোখের জল মোছে। কারও বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই। কারণ স্বাধীন দেশে তাকে অনেক কিছু দেওয়া হবে–এই প্রত্যাশা থেকে তো সে যুদ্ধ করেনি। কারও কাছে হাত পাততে হবে কেন? স্বাধীনতাই সত্য হয়ে সামনে ছিল তখন। শুধু গুলিবিদ্ধ ঊরুর ব্যথায় কাজ করতে

কষ্ট হয়, তখন যুদ্ধদিন মাথায় ঘূর্ণির মতো পাক খায়। আনন্দ ও যন্ত্রণার মিশেলে দিনগুলোকে ধুলোয় ভরে দেয়। বলে, তৈয়ব আলি, যুদ্ধের শত্রুরা তোমার চারপাশে আছে। ভুলে যেয়ো না।
ভুলমু ক্যান? ভুইলা যাইনি।
তৈয়ব আলি দাঁত কিড়মিড় করে।
হাশেম ঠোঙাভরা গুড়-মুড়ি নিয়ে আসে।
লন, খান। পান্তা নাই তো কী হইছে? মুড়ি তো আছে।
তৈয়ব আলি ঠোঙা থেকে মুড়ি নিয়ে মুখে পোরে। আবার আনমনা হয়ে যায়। দেখতে পায় ক্ষেতের আল দিয়ে তার পরিবার আসছে। সবার আগে তার স্ত্রী নসিমন। ছোট্ট লাঠির মাথায় যুদ্ধের সময়ের ছোট পতাকাটি বেঁধে নিয়েছে। পতাকাটি বাতাসে উড়ছে। তৈয়ব আলির পরিবারের ছোট দলটি নসিমনের পেছনে আসছে। কী সুন্দর দৃশ্য! তৈয়ব আলির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার আনমনা ভাব ছুটে যায়। সে সোজা হয়ে বসে।
স্বাধীনতার পরে নসিমনের সঙ্গে বিয়ে হয় তৈয়ব আলির। বাসররাতে নসিমনকে পতাকাটি দিয়ে বলেছিল, এইডা তোমারে দিলাম। যতন কইরা রাখবা। যুদ্ধের সময় আমি এইডা বুকের লগে বাইন্দা রাখতাম।
হাসিমুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নসিমন। দুই হাতে পতাকাটা আঁকড়ে ধরে বলেছিল, পতাকা!
হ, এইডার লাইগা যুদ্ধ করছি।
একজন মুক্তিযোদ্ধার লগে বিয়া হইব শুইনা আমি খুব খুশি হইছিলাম! ভাবছিলাম, আমার কত ভাইগ্য!
হাসতে হাসতে তৈয়ব আলি বলেছিল, গরিবের ঘরে সংসার করতে আসছ বইলা দুঃখু হয় নাই?
প্রবল বেগে মাথা নেড়েছিল নসিমন।
না, একটুও দুঃখু হয় নাই। আমিও তোমার লগে কাম করমু। সংসার ভইরা উঠব। গরিব বাপের সংসারে থাইকা আমি অভাব চিনছি গো!
অভাবের সঙ্গে লড়াই করা নসিমনের হাতে জাতীয় পতাকা। লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছ। বিশেষ দিনে পতাকাটি বের করে। অন্য সময় ট্রাঙ্কের নিচে ভাঁজ করে রেখে দেয়। ছেলেমেয়েদের অনেকবার ওই পতাকার গল্প শুনতে হয়েছে।
তৈয়ব আলির মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হাশেম হাসতে হাসতে বলে, কী দেখেন তৈয়ব ভাই?
মনে হয়, দ্যাশডা য্যান নতুন কইরা স্বাধীন হইছে। চল, আমরা ওগো লগে ঠ্যাং মিলাই।
তৈয়ব আলি হাশেমের হাত ধরে টেনে পরিবারের ছোট দলটির দিকে যেতে চাইলে বাধা দেয় সুলতান। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল সে। এখনো কাউকে পরোয়া করে না। তৈয়ব মিয়াকে দুই হাত দিয়ে টেনে ধরে বলে, খাড়ান।
ক্যান? তৈয়ব আলি ভুরু কোঁচকায়।
দ্যাশের আবার নতুন স্বাধীনতা কী? কী কন এইডা?
তৈয়ব আলি খেঁকিয়ে বলে, কমু না ক্যান? রাজাকারগো গলা ট্যার পাস না? জীবনপাত কইরা দ্যাশ স্বাধীন কইরা রাজাকারগো গলা হুনুম বইয়া বইয়া?
হা-হা করে হাসে সুলতান। বলে, চা খাইবেন?
না। চা ব্যাচস দেইখা কি তোর চা খাইতে হইব?
খান, খান। মুক্তিযোদ্ধার হাতের চা খাইলে রাজাকারের গর্জনে ভিরমি খাইবেন না।
ভিরমি! খামোশ। মুক্তিযোদ্ধা ভিরমি খায় না।
তৈয়ব আলির চিৎকারে জড়ো হওয়া মানুষেরা মুখ ফেরায়। নসিমন দ্রুত পায়ে এসে পতাকাটা স্বামীর হাতে দিয়ে বলে, ধরেন।
এইডা তো আমি তোমারে দিছিলাম। তুমি রাখো।
এইডা রাখার জন্য তুমি তো আসল মানুষ।

তৈয়বের বড় ছেলে বলে, বাজান, আপনে রাখেন।
তৈয়ব আলি বলে, ক্যান, আমি ক্যান, তোরা রাখ। আমি পতাকা আনছি। তোরা রাখবি। ডরাস কাউরে?
না, বাজান, কাউরে ডরাই না।
স্বামীর কথা শুনে নসিমন হাত গুটিয়ে নেয়। ছেলেমেয়েদের বলে, চল, আমরা মাঠের চারদিকে ঘুইরা আসি।
ওরা এগিয়ে গেলে জমায়েত হওয়া মানুষেরা ওদের পিছু নেয়।
ক্ষেতের আল ছেড়ে মেরাজ হোসেন মাঠে উঠে আসে। দিনমজুরি করে স্বাস্থ্য ভেঙেছে। যুদ্ধের সময় পাকিস্তান আর্মি তার বউকে উঠিয়ে নিয়ে গেলে আর খুঁজে পায়নি। দ্বিতীয়বার বিয়েও করেনি। বলে, আমার বউ যদি আমার সামনে আইসা খাড়ায়? যদি কোনোহানে থাকে?
এত দিনে আর থাকবে কি? মইরা গেছে।
আমি যুদ্ধ করতে গেছিলাম বইলা বউডারে শাস্তি দিছে ওরা। সালাম রাজাকার কামডা করছে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমি সালাম রাজাকারের কল্লাডা লইতে পারলাম না।
অহনও সময় আছে। লইতে চাইলে লইবেন।
সুরুজ মিয়া বারুদ ঠুকলে জ্বলে ওঠে মেরাজ হোসেনের চোখ।
শাণিত কণ্ঠে বলে, মরণের আর বাকি কী! আর একবার জ্বইলা উঠতে পারুম।
মুক্তিযোদ্ধা মেরাজ হোসেন শীতের সকালে হাঁপানির টান ঠেকায়। এবং ঠেকাতে পারেও। উজ্জ্বল চোখে আশপাশে তাকালে দেখতে পায় চারদিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা আসছে।
মেঘনাদ এসে কাছে দাঁড়িয়ে বলে, কেমন আছেন, মেরাজ ভাই?
আমার কনু শ্বাস নাই। দীর্ঘশ্বাসও ফেলুম না।
আমিও ফেলুম না। ফেলুম ক্যান? উপজেলার অফিসার যহন কয় আমার নাম মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাই, আমারে ভাতা দিব না, আমি কই, দিয়ো না। দ্যাশ স্বাধীন কইরা দিছি তোমাগো খাওনের লাইগা। তোমরা খাও, বাজানরা।
হা-হা করে হাসে মেঘনাদ। মেরাজ ওর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে।
এই দা লইয়া বনে যাই, মেরাজ ভাই। কাঠ জোগাড় করি। কাটি। বাজারে বেচি। চাইল কিনি। ভাত খাই। না পাইলে খাই না। আসি তো মুক্তিযোদ্ধা ভাতার লাগি বইয়া থাকি না।
হা-হা করে হাসে মেরাজ হোসেন। তার বুকে এখন শ্বাসকষ্টের টান নেই।
নসিমন পতাকা নিয়ে ফুলজান বিবির কাছে আসে। যুদ্ধের সময় স্বামী আর তিন ছেলেমেয়ে হারিয়েছে। একা বেঁচে আছে। থাকে গাঁয়ের মানুষের বাড়িতে। একেক দিন একেক জায়গায়। কেউ খেতে দিলে খায়। শরীর খারাপ হলে পড়ে থাকে গাছতলায়। কিন্তু তার স্মৃতি প্রখর। স্মৃতির ওপরে ধুলো জমেনি। গড়গড়িয়ে বলে যেতে পারে খুঁটিনাটি অজস্র ঘটনা। বলে, বৈশাখের প্রখর দিনে কীভাবে বুটের নিচে চাপা দিয়ে রেখে গুলি করে মেরেছিল স্বামী ও তিন ছেলেমেয়েকে। আর তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ক্যাম্পে। ক্যাম্পে প্রবল নির্যাতনের পরেও স্বামী-সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছিল ফুলজান। সাহস হারায়নি, মনোবল কমতে দেয়নি–দাঁত ঘষে সহ্য করেছে শারীরিক অত্যাচার। নিজের বন্দী জীবনকে কাজে লাগিয়েছিল। নানা কৌশলে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পাকসেনাদের অবস্থানের খবরাখবর পৌঁছে দিত। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করেছিল পাকসেনাদের ক্যাম্প। উড়িয়ে দিয়েছিল সেটি। সেই অবিস্মরণীয় দিনের কথা ভোলে না ফুলজান। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে, ভুলুম ক্যান? এমন দিনের কথা কমু বইলাই তো বাঁইচা আছি।

আজকে মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশে ফুলজান সেই দিনের কথা নয়নতারার মতো বয়সীদের কাছে বলবে। তার ছেঁড়া শাড়ির আঁচল দিয়ে শীত ঠেকানো যায় না। তার খিদে নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। ভাবে,

ঘর নেই তো কী হয়েছে, মানুষের বাড়ির গোয়ালঘর, ঢেঁকিঘর, বারান্দা তো আছে। কতটুকু জায়গাই বা তার দরকার। ফুলজান মনে করে, সে ভালো আছে। কারণ, তার বুকের মধ্যে যুদ্ধদিনের বিশাল স্মৃতি আছে। একদিন একজন সাংবাদিক তাঁকে বলেছিল, ‘আপনি আমাদের ইতিহাস।’
এতটুকু কথা ফুলজানের বুকে গেঁথে আছে। বড় সুখ ফুলজানের!

সভা শুরু হয়েছে।
মাইকে মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠ গমগম করছে। তারা যুদ্ধদিনের কথা শোনাচ্ছে। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। ছেলেমেয়েরা অবাক হয়! যে মানুষগুলো ক্ষেতে কাজ করে, রিকশা চালায়, চা বিক্রি করে, মাছ ধরে–তাদের বুকের ভেতরে কত সাহসের গল্প জমে আছে। তারা কেমন গলগল করে আর্মি ক্যাম্প আক্রমণের কথা বলছে, রাজাকারদের খতম করার কথা বলছে, শহীদ যোদ্ধাদের কথা বলে কাঁদছে, স্বাধীনতার স্বপ্নের কথা বলছে–তাদের কথা শুনে অভিভূত হয় ছেলেমেয়েরা।
ওদের চোখ জলে ভরে যায়।
ওরা ভাবে, গায়ে তাদের গরম কাপড় নেই তো কী হয়েছে, পৌষের রোদের চাদর ওদের শরীর জড়িয়ে আছে, রাত নামলে নাড়ার আগুনে গোল হয়ে বসা আছে। কুয়াশা কেটে গেছে। ঘাসে শিশিরের ছোঁয়া আর নেই। কী সুন্দর ঝকঝকে দিন! ছেলেমেয়েরা মনে করে, সাহসের গল্পের সঙ্গে ঝকঝকে দিনের সম্পর্ক আছে, অন্ধকারের সম্পর্ক আছে।
যেসব মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে জড়ো হয়েছে, তারা দেখতে পায় মাথার ওপর খোলা আকাশ, গাছের মাথায় পাখিদের বসে থাকা এবং মাঠের ওপারে ধানক্ষেত–পাকা ধানে নুয়ে আছে সোনালি শীষ। তবে দুঃখ কোথায়?
জীর্ণশীর্ণ বুকের খাঁচা? চোয়াল তোবড়ানো গাল? নড়বড়ে দাঁত? পেটের ব্যথা? না খেতে পাওয়ার যন্ত্রণা? হা-হা করে হাসে যোদ্ধারা! হাসতে হাসতে উড়িয়ে দেয় অলীক ভাবনা। তাঁদের চোখ থেকে স্বপ্ন ফুরোয় না। বয়সের ভারে কমে আসা দৃষ্টি পুনরায় দীপ্র হয়ে ওঠে।
ফুলজান মেঘনাদের হাতের কাঠ-কাটা দাটার দিকে তাকিয়ে বলে, দাটা আমারে দ্যান।
আপনে দা দিয়া কী করবেন?
আপনে যা করেন তা-ই করুম। আপনে দা আনছেন ক্যান?
এইডা আমার লগেই থাহে। হুগনা ডাল পাইলে কাইটা লইয়া বাড়ি যাই। পথেঘাটে কত রহম গাছ থাহে। আমার বউ, মাইয়ারা...
অদ্ভুত হাসি হাসে মেঘনাদ! ফুলজানের মনে হয়, হাসির মধ্যে কী যেন লুকিয়ে আছে। কী যেন বলতে চায় না মেঘনাদ।
ফুলজানের বুকের ভেতরটা ছলকে ওঠে। মনে হয়, মানুষটা দেখতে খুব সুন্দর! বড় চোখজোড়ায় জাদু আছে। ফুলজান দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।
কোম্পানি কমান্ডারের কণ্ঠ মাইকে গমগম করে। সে বিভিন্ন অপারেশনের কথা বলতে থাকে। দম নেয়। চোখ মোছে। তারপর আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তার কণ্ঠ। সে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সরকারের অবহেলা, দায়িত্বহীনতার কথা বলতে থাকে। বলে, মৃত্যুর পরে পুলিশের স্যালুট চাই না, বেঁচে থাকতে ভাত চাই। কোম্পানি কমান্ডার যখন ক্ষোভ আর অধিকারের কথা বলতে থাকে, তখন মেঘনাদ বলে, কমান্ডার তো কইল ভাবেন আপনেরা কী করতে চান। আমার ওই দা আছে, আপনে কী করবেন কন তো?
ফুলজান নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, আমার শরীল আছে, আছে মাথায় বুদ্ধি। আমার দা লাগব না। বন্দুকও না।
কমান্ডারের বক্তৃতা শেষ হয়। মেঘনাদ ফুলজানের হাত ধরে। লোকজন ঠেলে পৌঁছে যায় কমান্ডারের কাছে। তার হাত থেকে মাইক টেনে নিয়ে মেঘনাদ বলে, আপনেরা শুনেন, যেই শালারা বড় গলায় কথা কয়...

ফুলজান চেঁচিয়ে বলে, তাগোরে ছাড়ুম না।
সমাবেশের স্তব্ধ ভাব কেটে যায়। নড়েচড়ে বসে সমাবেশে আগত মানুষেরা। দেশের দূরদূরান্ত থেকে এসেছে সবাই। পথের ক্লান্তি নেই, জলতেষ্টা নেই। এতক্ষণ বসে থেকে যুদ্ধদিনের কথা শুনেছে। কোম্পানি কমান্ডার যখন বাস্তবতার কথা বলে, ওরা তো জানে, স্বাধীনতার এতগুলো বছর ধরে ওই বাস্তবতার সঙ্গেই লড়াই ওদের। ওরা উপেক্ষা করতেও শিখেছে। এতকাল ওরা বেঁচে থাকার গ্লানির কথা ভুলে গিয়েছিল। ওদের সামনে দিগন্তসমান আশাবাদ। ওরা বেঁচে ছিল সাহসের কাছে মাথা ঢুকিয়ে-ওদের শক্তির আশ্রয়ে জীবন কাটিয়ে। নেংটিপরা মানুষের প্রতিচ্ছবি হয়েও তারা দেশের যুদ্ধ করা মানুষ।
তৈয়ব আলি মাইক কেড়ে নিয়ে বলে, আপনারা বলুন-গর্জনের বিপরীতে গর্জন আছে। আমাদের কণ্ঠ নিঃশব্দ হয়ে যায়নি।
সবাই অবাক হয়ে তাকায়! কে এই তৈয়ব আলি? ক্ষুব্ধ ভাষায় কথা বলছে? যেন মুক্তিযোদ্ধাদের বিবেক!
সুলতান মাইক নিয়ে বলে, আমরা অহন পুরা গেরাম ঘুরুম। আমরা জানাইতে চাই যে আমরা আছি। আপনেরা কী বলেন?
আমরা আছি।
সবার সমবেত কণ্ঠ একযোগে গর্জে ওঠে, শ্লোগান ওঠে-রাজাকারের গর্জন/শুনব না, শুনব না। মেঘনাদ সাহা দা উঁচিয়ে বলে, কোন শুয়োরের বাচ্চা কথা বলবি? আমার সামনে এসে বল।
মেঘনাদের ভঙ্গি দেখে জ্যোৎস্না বুকে হাত দিয়ে বলে, কাকুর কী সাহস! দ্যাহো মোজাম্মেল, কাকুরে কেমুন জোয়ান দেহাইতাছে! মাগো, কী সোন্দর লাগতাছে!
মোজাম্মেল জ্যোৎস্নার হাত ধরে বলে-চলো, আমরা দাদুর পেছনে গিয়া খাড়াই।
ক্যান?
আমি তো দাদুর মতন হইতে চাই। তুমি হইবা না?
জ্যোৎস্না চকিতে মোজাম্মেলের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে, মোজাম্মেলের বুকের ভেতরের গভীরে বিজয়ের মাস ঢুকেছে। ও এখন স্বাধীন দেশের যোদ্ধা। ওই দাটা ও নিতে চায়।
নসিমন পতাকা হাতে মাঠ প্রদক্ষিণ শুরু করেছে। সমাবেশের লোকজন তার পেছনে হাঁটতে শুরু করে। লাঠির মাথায় বাঁধা ছোট পতাকাটি সূর্যের আলোয় চকচক করছে-মনেই হয় না যে সেটি যুদ্ধদিনের পতাকা-লাল সূর্যের মাঝখানে আটকানো আছে বাংলাদেশের মানচিত্র।
মোজাম্মেল জ্যোৎস্নার হাত ধরে।
আসো।
ও চমকিত হয়। বলতে চায়, তুমি আমার হাত ধরছ কেন? বলা হয় না। কারণ, ওর ভালো লাগছে। শুধু ভাবছে, গাঁয়ের ছেলে মোজাম্মেল কখনো তো কাছে আসেনি, আজ কী হলো? আসো।
হাত ছাড়ো।
না।
চারদিকে মানুষ।
থাক, দেখুক হগলে।
ভালোবাসার আশ্চর্য অনুভব নিয়ে দুজন ছুটে যায় মেঘনাদ আর ফুলজানের পেছনে। মেঘনাদ ওদের ঘাড়ে হাত রেখে বলে, আয়।
সমাবেশ তখন একটি বিশাল জনসমুদ্র।